আবদ্ধ পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ির আধা-নিবিড় চাষ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ঘেরে ১৯৯৪ সালে ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাবের ফলে আধা-নিবিড় বাগদা চিংড়ি চাষ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এতে চিংড়ির সার্বিক উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই চাষ পদ্ধতি পুনরায় শুরু করার লক্ষ্যে ইনষ্টিটিউট থেকে আবদ্ধ পদ্ধতিতে বাগদা চিংড়ি আধা-নিবিড় চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ভাইরাসমুক্ত অবস্থায় বাগদা চিংড়ি চাষ করা অনেকাংশে সম্ভব।

আবদ্ধ পদ্ধতি বৈশিষ্ট্য

- প্রতি ঘেরে একটি জলাধারের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে জলাধার হতে পরিশোধিত পানি ব্যবহার করা
- পানির গভীরতা ১.০ মিটার এর অধিক রাখার ব্যবস্থা করা। বাহিরের জোয়ার কিংবা পার্শ্ববর্তী ঘেরের পানি কোনভাবেই যাতে ঘেরে ঢুকতে না পারে সে ব্যবস্থা করা
- কোন জৈব সার ব্যবহার না করা। ঘেরে জৈব পদার্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পরিমিত খাদ্য প্রয়োগ করা
- ঘেরে জমাকৃত জৈব পদার্থের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- জলজ আগাছা, ব্যাকটেরিয়া ও ক্ষতিকারক গ্যাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঘেরের পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা
- ঘেরের মাটি ও পানির বাফার ক্ষমতা, পি-এইচ ও ক্ষারত্বসহ অন্যান্য ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলীসমূহ স্থিতিশীল রাখা
- চাষকালীন সময়ে পানিতে পর্যাপ্ত প্লাঙ্কটন (প্রাকৃতিক খাদ্যকণা) এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

ঘের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

- ঘেরের পাড় নির্মাণঃ ঘেরের পাড় শক্ত ও উঁচু হতে হবে যাতে প্রয়োজনে প্রায় ১.৫ মি. উচ্চতায় পানি ধরে রাখা যায়। পাড়ে কাঁকড়া বা ইঁদুরের গর্ত থাকতে তা ভালভাবে বন্ধ করতে হবে
- জলাধার নির্মাণঃ মোট চাষ এলাকার ১৫-২০% এলাকায় একটি জলাধার নির্মাণ করতে হবে, যাতে প্রয়োজনে জলাধার হতে পরিশোধিত পানি সহজে চাষের ঘেরে সরবরাহ করা যায়
- ঘের শুকানোঃ সমস্ত জলজ আগাছা পরিস্কার করে ঘের এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে ঘেরের মাটি ফেটে না যায় এবং যে কেউ ঘেরের উপর দিয়ে হাঁটলে পায়ের হালকা ছাপ মাটিতে পড়ে
- তলার মাটি সরানোঃ মাটির উপরে জমাকৃত ৬-৮ সে.মি. এর অতিরিক্ত কাদা সরিয়ে ফেলতে হবে
- চুন প্রয়োগঃ হেক্টর প্রতি ২৫০ কেজি হারে ডলোচুন ও পাথুরে চুন এর মিশ্রণ (৩:১) খুব সকালে ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরের তলা হতে পাড়ের উপরিভাগ পর্যন্ত চুন ছিটাতে হবে
- মাটি চাষঃ ঘেরের উপরের ৬-৮ সে.মি. মাটি চাষ করে চুন ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে
- ঘেরে প্রবেশ পরিরোধ ব্যবস্থাঃ ঘেরের চারিদিকে ছোট ফাঁসের নাইলনের জাল দিয়ে প্রায় ১ মি. উঁচু করে এমনভাবে ঘেরা দিতে হবে যাতে কোন সাপ, ব্যাঙ কিংবা অন্য যে কোন প্রাণী ঘেরে প্রবেশ করতে না পারে।
- নার্সারী স্থাপনঃ ঘেরের এককোণে ঘেরের ৫-৭% এলাকায় বাঁশের ফ্রেম ও ছোট ফাঁসের নাইলনের জাল দিয়ে প্রায় ১.৫ মি. উঁচু করে ঘিরে একটি নার্সারী তৈরী করতে হবে। ঘেরে পানি ঢুকানোর

পর নার্সারীর ভিতরে পোনার আশ্রয় হিসাবে কয়েকটি নাইলনের জাল লম্বালম্বি ও খাড়া করে ঝুলিয়ে দিতে হবে

- পানি সরবরাহঃ পার্শ্ববর্তী নদী বা খাল হতে ছেঁকে প্রয়োজনীয় লবনাক্ত পানি (কমপক্ষে ১.০ মি.) ঘেরে প্রবেশ করাতে হবে
- অবাঞ্চিত প্রাণীকূল নিধন ও পানি শোধনঃ পানিতে ১.০-১.৫ পিপিএম হারে রোটেনন ব্যবহার করে লাল রক্ত বিশিষ্ট সব প্রাণীকূল নিধন করা যেতে পারে। চিংড়ি ও কাঁকড়াসহ অন্যান্য সাদা রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী নিধনের জন্য ১.৫ পিপিএম হারে ডিপটারেক্স প্রয়োগ করা যেতে পারে। নিধনকৃত সব প্রাণী যথাশীঘ্র পানি হতে তুলে ফেলার পর পানি শোধনের জন্য ২০-২৫ পিপিএম হারে ব্লিচিং ব্যবহার করা যেতে পারে
- পানিত চুন প্রয়োগঃ প্রাণীকূল নিধনের ৩-৪ দিন পর প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ পিপিএম হারে ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে
- সার প্রয়োগঃ চুন প্রয়োগের দু'দিন পর ইউরিয়া ২.০-২.৫ পিপিএম; টিএসপি ৩.০-৩.৫ পিপিএম; এবং পটাশ ০.৬-০.৮ পিপিএম হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইউরিয়া ও পটাশ ছিটিয়ে এবং টিএসপি অবশ্যই পানিতে গুলে প্রয়োগ করতে হবে
- পানিতে বাতাস সরবরাহের ব্যবস্থাঃ ঘেরের চারদিকে পাড় হতে ২.০-২.৫ মিটার দূরত্বে একটি করে পেডেল হুইল স্থাপন করতে হবে। ১,৫০০-২,০০০ বর্গ মিটার আয়তনের প্রতিটি পুকুরের জন্য একটি পাম্প মেশিনের সাহায্যে পানি অন্দোলনের মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় বাতাস সরবরাহ করা যেতে পারে।

পোনা মজুদ

- ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে প্রতি ব.মি. ১০-১২ টি সুস্থ ও সবল ভাইরাসমুক্ত বাগদা চিংড়ি পোনা মজুদ করা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশী লাভজনক এবং পরিবেশ টেকসই
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোনা নার্সারীতে মজুত করতে হবে। ১৫-২০ দিন প্রতিপালনের পর নার্সারীর ঘেরা জাল তুলে দিলে চিংড়ি সম্পূর্ণ ঘেরে ছড়িয়ে যাবে।

খাদ্য সরবরাহ

- নার্সারীতে পোনা মজুদের পর দৈনিক ৬ ঘন্টা অন্তর ১ম, ২য় এবং ৩য় সপ্তাহে মোট পোনার ওজনের যথাক্রমে ১০০-১২৫%, ৮০% এবং ৬০% হারে নার্সারী খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে
- সম্পূর্ণ ঘেরে পোনা অবমুক্ত করার পর অর্থাৎ চাষের ৪র্থ, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক ৬ ঘন্টা অন্তর মোট পোনার ওজনের যথাক্রমে ৩০%, ২০% এবং ১০% হারে খাদ্য ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে
- এরপর চাষের ৭০-৭৫ দিন পর্যন্ত দৈনিক ৬ ঘন্টা অন্তর এবং পরবর্তী দিনসমূহে দৈনিক ৪ ঘন্টা অন্তর খাদ্যের অপচয়রোধে 'চাহিদানুযায়ী খাদ্য সরবরাহ' পদ্ধতিতে মজুদকৃত চিংড়িকে ট্রেতে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। এজন্য প্রতি হেক্টরে সমান দুরত্বে ১৪০-১৫০ টি খাবার ট্রে স্থাপন করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে ট্রেতে অতিরিক্ত খাবার অবশিষ্ট না থাকে
- খাদ্য প্রয়োগের পর আনুমানিক এক ঘন্টা প্যাডেল হুইল কিংবা পাম্প চালানো যাবে না
- চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ৩৫-৪০% আমিষ, ২০-৩০% শর্করা, ৫-১০% ফ্যাট ও ১-২% ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স সমৃদ্ধ পিলেট খাবার প্রয়োজন।

বাতাস/ অক্সিজেন সরবরাহ

- ঘেরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ৪ পিপিএম এ নেমে এলে পেডেল হুইল কিংবা পাম্প চালিয়ে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে
- এছাড়া জমাকৃত জৈব পদার্থসমূহ যাতে না পঁচে তাড়াতাড়ি প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে, সেজন্য অন্ততঃ দৈনিক কয়েক ঘন্টা পেড়ে হুইল/ পাম্প চালাতে হবে।

পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন

- পানি সরবরাহের প্রয়োজন হলে জলাধারের পানি পরিশোধন করে ৮-১০ দিন পর ঘেরে সরবরাহ করতে হবে। ঘেরের কোন পানি পরিবর্তন করা যাবে না।

চুন ও সার প্রয়োগ

- পি-এইচ ৭.৫ এর নীচে নেমে গেলে কিংবা সকাল ও বিকালের পি-এইচ এর মাত্রা ০.৫ এর বেশী হলে অবশ্যই চুন প্রয়োগ করতে হবে। এ অবস্থায় প্রতি হেক্টরে ১০-১৫ পিপিএম হারে ডলোচুন প্রয়োগ করা যেতে পারে
- পানির স্বচ্ছতা ৩৫ সে.মি. বেশী হলেই ১.০-১.২ পিপিএম ইউরিয়া এবং ১.৫-১.৮ পিপিএম টিএসপি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আগাছা নিয়ন্ত্রণ

- যে কোন ধরণের জলজ আগাছা আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষে একটি বিশেষ প্রতিবন্ধকতা। কারণ জলজ আগাছা জন্মালে ঘেরের পানির গুণগতমান সহনীয় পর্যায়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই দৈনিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কায়িক শ্রম দ্বারা আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

ব্যাকটিরিয়া নিয়ন্ত্রণ

ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে পুকুরের জমাকৃত জৈব পদার্থ, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন, পি-এইচ ও তাপমাত্রা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন ও জৈব পদার্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকলে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া বংশ বৃদ্ধির সুযোগ পায় না। এন্টিবায়োটিক্স প্রয়োগের মাধ্যমে ঘেরে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া কার্যকারিতা নষ্ট করা যায়। কিন্তু সঙ্গত কারণে চিংড়ি পুকুরে বিষাক্ত এন্টিবায়োটিক্স ব্যবহারের উপর বিধি-নিষেধ রয়েছে। তাই ঘেরে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ কমিয়ে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য রাসায়নিক পদ্ধ এবং জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

রাসায়নিক পদ্ধতিঃ পুকুরের ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য চাষের ৪০-৪৫ দিন পর হতে প্রতি মাসে একবার ৪-৬ পিপিএম হারে ব্লিচিং প্রয়োগ করতে হবে। এতে সব ধরণের ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ কমে যাবে।

জৈব প্রযুক্তিঃ ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রোবায়োটিক্স ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণত চাষের ৪০-৪৫ দিন পর থেকে ব্লিচিং প্রয়োগের দু'দিন পর ১.০-১.৫ পিপিএম হারে প্রোবায়োটিক্স প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনেক সময়

দেখা যায় যে, ৭০-৮০ দিন চাষের পর অতিরিক্ত জৈব পদার্থ জমা হওয়ার ফলে ঘেরের মাটিতে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস তৈরী হয়ে মাটির রং কালচে হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, ১.৫-২.০ পিপিএম হারে প্রোবায়োটিক্স বেলে মাটির সাথে মিশিয়ে মন্ড করে ঘেরে সরবরাহ করলে সুফল পাওয়া যায়।

পানিতে দ্রবীভূত ক্ষতিকারক গ্যাস নিয়ন্ত্রণ

ঘেরে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ছাড়াও চিংড়ির জন্য ক্ষতিকারক বিভিন্ন ধরণের গ্যাস (অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি) তৈরী হয়ে পানিতে দ্রবীভূত হয়। পুকুরের পরিবেশ সুস্থ রাখার স্বার্থে পানিতে যাতে কোনভাবেই ক্ষতিকারক গ্যাসমূহের মাত্রা বৃদ্ধি না পায়, সেজন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব ক্ষতিকারক গ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

- চাষের দু'মাস পর থেকে অন্তত মাসে একবার ৩০-৪০% পানি পরিবর্তন করলে পুকুরে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই জলাধারের পরিশোধিত পানি ব্যবহার করতে হবে। তবে দিনে ১০-১৫% এর বেশী পানি পরিবর্তন করা উচিত হবে না। এতে চিংড়ি পীড়িত হতে পারে
- পুকুরে কোন প্রকার জৈব সার প্রয়োগ হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে
- পুকুরে সম্পূরক খ্যার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ অপরিমিত সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারে পুকুরে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং পানি দূষিত হয়
- পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন এর উপস্থিতি নিশ্চি করতে হবে
- অ্যামোনিয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য চাষের ৫০ দিন পর থেকে প্রতি মাসে ৩.০-৪.০ পিপিএম হারে জিওলাইট ব্যবহার করা যেতে পারে
- পানি কিংবা মাটিতে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার বংশ বৃদ্ধি রোধ করতে হবে
- পুকুরে প্ল্যাঙ্কটন উৎপাদনের সহনশীল মাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে
- চাষের ৫৫-৬০ দিন পর থেকে মাঝে মাঝে মাটিতে ধীর গতিতে হররা টেনে দিলে মাটির অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর গ্যাসের মাত্রা কমে যাবে। হড়রা টানার পূর্বে পানিতে পর্যাপ্ত দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নিশ্চিত করতে হবে।

চিংড়ি বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা

- চাষকালীন সময়ে সপ্তাহে একবার চিংড়ির বৃদ্ধি পরীক্ষা এবং দৈনিক অন্ততঃ একবার চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন
- খাবার প্রয়োগের এক ঘন্টা পর ট্রে তুলে ট্রেতে উঠে আসা চিংড়িসমূহ ধরে চিংড়ির ওজন স্বাভাবিক আছে কি না এবং চিংড়ির খাদ্যনালীতে পর্যাপ্ত খাদ্য আছে কি না তা পরীক্ষা করা যেতে পারে। সময়ে চিংড়ির গায়ে কোন রোগের চিহক্রও আছে কি না তাও পরীক্ষা করা যেতে পারে
- কোন চিংড়ি পাড়ের কাছাকাছি স্থিরভাবে বসে থাকলে বুঝতে হবে যে ঘেরে কোন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায়, অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য তড়িৎ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং পাড়ে বসে থাকা চিংড়িটি ধরে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে
- রোগ প্রতিরোধের স্বার্থে পরিশোধিত ব্যতীত কোনক্রমেই এক ঘেরে ব্যবহৃত জিনিষপত্র অন্য ঘেরে ব্যবহার করা যাবে না।

উৎপাদন

এই পদ্ধতিতে ১২০ দিন লালন করার পর প্রতি ব. মি. ১০টি ঘনত্বে চিংড়ির গ. ওজন ৩০ গ্রাম এবং বাঁচার হার ৭৫% হিসাবে প্রতি হেক্টরে মোট ২,২৫০ কেজি চিংড়ি উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। শতকরা ২০ ভাগ জলাধারের আয়তন বিবেচনা করলে প্রতি হেক্টরে উৎপাদন দাঁড়াবে ১,৮৭৫ কেজি। একই পদ্ধতিতে প্রতি বর্গ মিটারে ১৫টি মজুদ ঘনত্বে চাষী পর্যায়ে চাষ করে হেক্টর প্রতি ২,৫০০ কেজি উৎপাদন পাওয়া যায়।

আয় ও ব্যয়

এক হেক্টর ঘেরে প্রতি বর্গ মিটারে ১০টি মজুদ ঘনত্বে চিংড়ি চাষ করে সর্বমোট উৎপাদন খরচ হবে টা. ৪,০০,৮২০/- এবং উৎপাদিত চিংড়ি বিক্রি করে মোট আয় হবে টা. ৯,৭৮,০০০/-। অর্থাৎ এক হেক্টর জমি হতে এক মৌসুমে (৫-৬ মাস) টা. ৫,৭৭,১৮০/- নীট মুনাফা অর্জিত হবে। পানিতে দীর্ঘস্থায়ীত্ব সম্পন্ন উন্নত মানের দেশীয় চিংড়ি খাদ্য সহজলভ্য হলে উৎপাদন ব্যয় আরও ২০% কমানো সম্ভব।

পরামর্শ

- চিংড়ি আহরণের পর ঘেরের জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ পানি ও তলায় পুঞ্জিভূত জৈব পদার্থ বাইরে বের না করে পুকুরেই রিসাইক্লিং করার জন্য ফসল চক্র ভিত্তিক চাষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে
- এজন্য দ্বিতীয় ফসলে আবর্জনা ও উদ্ভিদভোজী মাছ চাষ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে
- অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফসলচক্রভিত্তিক চাষ ততটা লাভজনক না হলেও পরিবেশ সহনীয় ও টেকসই প্রযুক্তি হিসাবে আবদ্ধ পদ্ধতির চাষে ফসল চক্রের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।